সংবাদ

তারিখ ... 6 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মাদ্রাসা শিক্ষাধারা

এ এন রাশেদা

৬ এপ্রিল ২০১২-এর ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। হাজার হাজার মানুষ। মাথায় টুপি, সাদা আলখেল্লা ও পরনে পায়জামা বা লুঙ্গি, আভিজাত্যের চাকচিক্যবিহীন; একটি লাইন রক্ষা করে জোর কদমে এগিয়ে আসছে- নামাজের সময় যেমন কাতারবন্ধ হয়ে দাঁড়ায় সেরকমভাবে। এদের দেখে ধনী ঘরের সন্তান ভাবার কোন কারণ নেই। এরা কেউ লেখাপড়া করেছে এবং কেউ করছে মাদ্রাসা ধারায়। যে শিক্ষক এদের শিখিয়েছে অন্যকে নাস্তিক বলতে। করেছে নারী বিদ্বেষী, টেলিভিশনকে শয়তানের বাক্স এবং ভাস্কর্যকে ইসলামবিরোধী বলে জানিয়েছে। কোন প্রশ্ন না করে, কোন যুক্তি উত্থাপন না করে যা কিছু শেখে তাদের নিজস্ব ধারার লোকদের কাছে- তা মেনে নিতে শিখেছে বিচার বিশ্লেষণ না করে, ভালোমন্দ না জেনেই। তাই তাদের সমাবেশে কোন এক নারী সাংবাদিককে দেখে হয়তো কারও নির্দেশে কোন যুক্তির অবকাশ না রেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বেধড়ক পিটিয়েছে- আখেরে বেহেশত পাবে ভেবে।

আর একদিকে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিকে তাকিয়ে দেখছি- নানা বয়সের নানা রঙের পরিচ্ছদে আবালবৃদ্ধবনিতার যেন ঢল নেমেছে। পথে পথে আলপনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের শ্রমে ঘামে বর্ণিল মঙ্গল শোভাযাত্রা-আমাদের রাজাকারদের আদলে ভয়ঙ্কর সব জন্তু- জানোয়ারের প্রতিকৃতি নিয়ে, ভোরের শুরুতে ছায়ানটের আয়োজনে রমনা বটমূলে আবৃত্তি ও গানে গানে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। একইভাবে ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে কত রঙিন অনুষ্ঠান, রাস্তায় সারিবদ্ধ হাজার হাজার গাড়ি- এসব অনুষ্ঠানে আগত। অতিথিদের আভিজাত্যের ভিন্নরূপ চেহারাই বহন করে। এছাড়াও সারা গ্রামবাংলা জুড়ে বৈশাখী মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নিরামিষ ভোজন, মিষ্টান্ন পরিবেশন চলে। আর চলে দেশব্যাপী-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উৎসবের আমেজে হালখাতা। পুরনো হিসাব বন্ধ করে নতুন হিসাব শুরুর আনন্দ যাত্রা। তবে হেফাজতে ইসলাম কার্যত জামায়াতে ইসলামীরা পহেলা বৈশাখের সব ধর্ম-বর্ণের অসাম্প্রদায়িক উৎসব না-জায়েজ বলে মনে করে। তার প্রমাণ তারা ২০০১ সালে রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। বলা যেতে পারে এই ভিন্ন দুটি দিনের ভিন্ন চিত্র প্রমাণ করে দেশ আজ সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই বিভক্ত। এছাড়াও আছে ভূরি ভূরি প্রমাণ। এদেশের কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণী সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিভক্তির কথা বললেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্তির কুফলের দিকটি আলোচনায় আনতে দেন না সংগঠিতভাবে এমন কি বল প্রয়োগ করে। এভাবেই তারা মুক্তিযুদ্ধের শোষণমুক্তি ও সাম্যের চেতনাটির কথা অস্বীকার করেন। এদের অনেকেই আবার ঘুস-দুর্নীতি বা নানা কদর্য পন্থায় যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন- তারই এক অংশ দিয়ে গ্রামে বাবা-মা'র নামে একাধিক মাদ্রাসা করেছেন কিন্তু সাধারণ ধারার প্রাইমারি স্কুল করেননি। তারা মসজিদের ভেতরে-বাইরে টাইলস লাগিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করেন। মসজিদের কেউ প্রশ্ন করেন না- টাকাগুলো কোন অনৈতিক পথে অর্জিত কি না? ইসলামে ঘুষ-সুদ ও সব প্রকার অনৈতিক পন্থায় উপার্জিত অর্থ হারাম। অথচ হারাম অর্থ নিতে মসজিদ কর্তৃপক্ষের বাধে না। এভাবেই কালো টাকা দিয়ে তৈরি হয় মাদ্রাসা ও মসজিদ। সরকারি অনুদানও আছে।

প্রায় সব মাদ্রাসা এমন কি সাইনবোর্ড সর্বস্ব মাদ্রাসাও একসময় এমপিওভুক্ত হয়েছিল- সব শাসকদের এমপি, মন্ত্রীদের অবৈধ হস্তক্ষেপে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে। আশির দশকে প্রাথমিক শিক্ষাধারাকে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত ও দিকভ্রান্ত করেছে তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি ১৪ হাজার প্রাথমিক পর্যায়ের ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন- যা সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারার পরিপন্থী। কারণ ১৭ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে এভাবে : ৭(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।' অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এরপর কী হারে ইবতেদায়ি থেকে দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল পর্যন্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে তার প্রমাণস্বরূপ একটি সারণি দেখা যেতে পারে।

সারণি-১ বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা (৩ বছর দেখান হলো)

বর্ষ	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
১৯৮৯	৪১৩০	৭৫৬	৭১১	৯০
১৯৯৩	৩৮২৫ (৩২৭)	৮০৬ (১৯)	৮৩২ (৪)	১০০
২০০৮	৬৭৭৯	১৪০১	১০১৩	১৮৮ (সরকারি ৩)

সারণি-২ বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বৃদ্ধির তুলনা

বর্ষ	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
১৯৮৯	৫৮৭৩৭২	১৫৬৬৮২	১৮২৩৫৪	৩৩৯২৮
১৯৯৩	৮৯২৪৬২	২৯৭৬৮৯	৩৫৫০০০	৬২৫৯১
২০০৮	১১০৮৬৬২	৪১২৭৫	৩২৯৩৩১ ৩৫০৪ (সরকারি)	১১৩৩৩৯ (বেসরকারি)

• বি. দ্র. ইন্টারনেটে ২০০৮ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য

এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় মাদ্রাসা পর্যায় শিক্ষার্থী ক্রমাগত বাড়ছে। উল্লেখ্য, ৯৫-৯৬ সাল শিক্ষা বাজেটে মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ ছিল। ইউনিসেফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অনবরত আধুনিকায়নের শর্তসহ মাদ্রাসা শিক্ষাবিস্তারের প্রতি জোর দিয়ে চলেছে। এসব নানাবিধ প্রচারণায় মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অধিক হয়েছে কিন্তু চিন্তাধারায় কি তারা আধুনিক হয়েছে? মাদ্রাসা শিক্ষাধারা কি কাউকে আধুনিক মননের করে? বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রকৃতিবাদী করে? মানুষের কল্যাণকর কোন কাজ করে? দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা তাদের আছে?

এবার আলোচনা করা যেতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় সাংস্কৃতিক জীবনটা কী? ২০১২ সালে নতুন কারিকুলাম ঘোষিত হলেও অধিকাংশ মাদ্রাসাই তা অনুসরণ করছে না। এই দীর্ঘ বছর তো করেইনি এখনও না। জাতীয় সংগীতকে সাধারণত মাদ্রাসার মূল্যবোধের বিরোধী বলে মনে করে। অধিকাংশ মাদ্রাসাতে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মহান জাতীয় দিবসগুলো পালিত হয় না। জাতীয় দিবস পালন না করলে জাতীয় চেতনা কীভাবে গড়ে উঠবে? এসব প্রতিষ্ঠানে দেশের কৃতী শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, খেলোয়াড় সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দেয়া হয়। তাই বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানসহ অনেকেই তাদের কাছে অপাংক্তেয় ও তাদের ভাষায় 'কাফের'। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকই জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, তবলিগ জামাত ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। আর ছাত্ররা বেশিরভাগ ইসলামী ছাত্রশিবিরের পতাকাতলে। অন্যরা সংগঠিত 'তারাবায়ে আরাবিয়া', ইসলামী ছাত্র পরিষদ, 'সাহাবা ছাত্র পরিষদ', 'আঞ্জুমানে নওজোয়ান, ইসলামী ছাত্র কাফেলা', 'ইসলামী ছাত্রশক্তি', ইসলামী ছাত্রসেনা', 'জাতীয় সুন্নি আন্দোলন', 'গাউসিয়া ছাত্র পরিষদ' ইত্যাদির সঙ্গে। ফলে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা কোনভাবেই ছাত্রদের মধ্যে গড়ে উঠা সম্ভবপর নয়। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সব মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। মাদ্রাসাগুলো ছিল পাকিস্তান রক্ষার ক্যাম্প, হাতেগোনা দু-একটি ছাড়া। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে তারা জিহাদ হিসেবে নিয়েছিল। যে চিন্তাচেতনা এসব মাদ্রাসা শিক্ষাধারা ও পরিবেশে বহমান- সেখানে নতুন কারিকুলাম যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তুলবে- এমন প্রত্যাশা করা হবে বাতুলতা। তবে ব্যতিক্রম সবসময়ই থাকে।

এভাবেই সমাজে সরকারি ও বেসরকারি আনুকূল্যে বেগবান হয়েছে সাম্প্রদায়িক মাদ্রাসা সংস্কৃতির ধারা, যারা কথায় কথায় চাপাতি বা ধারালো অস্ত্র নিয়ে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তাক্ত করে, হাত-পায়ের রগ কেটে পঙ্গু করে, চলন্ত গাড়িতে আগুন দিয়ে ড্রাইভার ও যাত্রীদের পুড়িয়ে মারে, রেললাইনের স্লিপার তুলে ফেলে হাজার হাজার যাত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে, শত শত বাস, ট্রাক, গাড়ি, রেলের বগিতে আগুন দিয়ে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, পুলিশের মাথা থেঁতলিয়ে দেয়ার মতো হাজারও অপকর্ম করে। এরা এদেশের জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের নাস্তিক উপাধি দিয়ে হত্যার হুমকি দেয় ও করে। অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদসহ আরও অনেককেই তারা হত্যার জন্য আক্রমণ করেছে এবং হত্যা করেছে।

আগেই বলা হয়েছে এদের আগমন দরিদ্র শ্রেণী থেকে। ধনিক শ্রেণীর সন্তানরা এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসে না কিন্তু বিভাজন তৈরিতে ওই ধনিক-বণিকরাই অগ্রগামী এবং সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিকরা। সরকারসহ এদের অবিবেচক নীতি এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক রূপে গড়ে তুলছে যা সাম্যের চেতনার বিরুদ্ধে, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে।